বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নজরুল

'নবযুগ'

ইংরেজী ১৯২০ সাল। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের বাসভবন ছিল তখন কোলকাতার ৬নং টার্ণার স্ট্রীটে। সে সময় খেলাফত আন্দোলন খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই জেগে উঠেছিল একটা রাজনৈতিক চেতনা। সমগ্র ভারতে জোরদার হয়ে উঠেছিল ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন। আর সে আন্দোলনে কংগ্রেস ও খেলাফত পার্টি একযোগে কাজ করে যাচ্ছিল। সময়টা দৈনিক কাগজ বের করার জন্যে বেশ অনুকূল মনে করে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম হক সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ করেন। ফজলুল হক সাহেব বহুদিন পূর্বেই একটি পত্রিকা বের করার সংকল্প করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে ২২নং টার্ণার স্ট্রীটে একটি ছাপাখানাও স্থাপন করেছিলেন্ বর্ধমানের জনপ্রিয় নেতা মৌলভী আবুল কাসেমও এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গী ছিলেন। তিনিও টার্ণার স্ট্রীটেই থাকতেন। মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল ইসলামের সাথে প্রথম আলোচনাতেই হক সাহেব এদেরেকে নিয়ে কাগজ বের করতে রাজী হয়ে গেলেন।

পত্রিকাটির নাম রাখা হলো 'নবযুগ'। ঠিক হলো সান্ধ্য দৈনিক হিসেবে এটি বের হবে! পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক হলেন মুজফ্ফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলাম। সম্পাদনার ভার পড়লো প্রধানত: নজরুলের উপর। সে সময়ে মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম থাকতেন ৮-এ, টার্ণার স্ট্রীটে।

১৯২০ সালের মে মাসে 'নবযুগ' প্রথম প্রকাশিত হয়। রয়েল সাইজের একশীট কাগজে প্রতিদিন সন্ধ্যায় 'নবযুগ' বের হতো। প্রকাশের সাথে সাথেই পত্রিকাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নজরুলের শাণিত ভাষায় হেডি এবং সংবাদ পরিবেশনের বৈচিত্র্য পাঠকদের আকৃষ্ট করে। খুব অল্প দিনের মধ্যেই 'নবযুগে'র চাহিদা বৃদ্ধি পায়। দৈনিক কাগজে কাজের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নজরুলের ছিলো না, তথাপি আশ্চর্য কৃতিত্বের সংগে তিনি বড় বড় সংবাদগুলিকে সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখে পরিবেশন করতেন।

'নবযুগ'-এ নজরুল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। তৎকালীণ গবর্ণমেন্ট নজরুলের কয়েকটি প্রবন্ধের জন্য 'নবযুগ' পত্রিকাকে বারবার সতর্ক করে দেন। কিন্তু নজরুল সে সতর্কবাণী গ্রাহ্য করেননি। শাসন, শোষণ, অন্যায়, অত্যাচারের

বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী অধিকতর প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠে। 'নবযুগ'-এর একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন ঃ

"ঐ শোন, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দিদের শৃংখলের ঝণৎকার। তাহারা শৃংখলমুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙিবে। .....এখনো বিশ্বে দানবশক্তির বজ্রমুষ্টি আমাদের টুটি চিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। এ অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বাঁচিবে না! এ হোম-শিখায় যদি কেহ যোগ না দেয়, আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দিব।'

'নবযুগ'-এ নজরুল ইসলামের 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশের জন্য ১৯২০ সালের শেষের দিকে সরকার কাগজের জামানত বাজেয়াপ্ত করেন। 'নবযুগ' অফিসে পুলিশের আনাগোনা চলতে থাকে।

জনাব এ.কে. ফজলুল হক তাঁর কাগজে এতোটা 'বাড়াবাড়ি পছন্দ করলেন না। 'নবযুগে'র প্রধান পরিচালক হিসেবে তাঁর নামই ছাপা হতো। জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর আর কাগজ বের করবেন কিনা, সে বিষয়ে হক সহেব চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদের রাজনৈতিক মতবাদ তিনি পছন্দ করতেন না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত পুনরায় জামানাত দিয়ে হক সাহেব 'নবযুগ' বের করেন। কিন্তু মতভেদ দেখা দেওয়ায় ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নজরুল 'নবযুগ' ছেড়ে চলে যান। নজরুল ইসলাম মাত্র আট মাস কাল 'নবযুগে'র সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, আর এটাই ছিলো সংবাদপত্রে তাঁর প্রথম চাকুরী। নজরুল 'নবযুগ' ছেড়ে দেবার মাত্র একমাস পরই কাগজটি বন্ধ হয়ে যায় এবং নজরুলের প্রথম সাংবাদিক জীবনের অবসান ঘটে।

'নবযুগ'-এ নজরুল ইসলাম যেসব প্রবন্ধ লেখেন, তার অধিকাংশ সংকরিত করে পরবর্তীকালে 'যুগবাণী' নামক পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। 'যুগবাণী' নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

১৯২১ সালে বর্ধমানের মৌলভী আবুল কাসেম পুনরায় 'নবযুগ' প্রকাশের চেষ্টা করেন। তিনি নজরুলকে 'ধরে' আনেন, কিন্তু কাগজের কাটতি না হওয়ায় পত্রিকাটি অচল হয়ে পড়ে।

নজরুল ইসলাম তখন 'নবযুগ' ত্যাগ করে ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লা চলে যান।

'সেবক'

১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ 'সেবক' নামে একখানি দৈনিক পত্রিকা বের করেন। ১৯২২ সালের মে মাসে নজরুল কুমিল্লা থেকে কোলকাতায় ফিরে এসে 'সেবক'-এ যোগদান করেন। কিন্তু নজরুলের লেখায় 'হিন্দুয়ানী ভাব' ছিল বলে মওলানা সাহেব আপত্তি তোলেন। 'সেবক' এর ভারপ্রাপ্ত

সম্পাদক ছিলেন মওলানা সাহেবের মতের অনুসারী। তিনিও মওলানা সাহেবের আপত্তিতে সায় দেন।

১৯২২ সালের ২৫শে জুন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু হয়। নজরুল ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম ভক্ত। তিনি তাই কবির মৃত্যু উপলক্ষে 'সেবক'-এ একটি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখেন। সম্পাদক ও পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিকগণ মিলে নজরুলের প্রবন্ধটি কাটছাঁট করে 'হিন্দুয়ানী ভাব' বদলে দিয়ে তা 'সেবক'-এ প্রকাশ করেন। নজরুল তাঁর লেখার এই অভাবনীয় পরিণতি দেখে দারুণ অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হয়ে উঠেন এবং সাথে সাথেই 'সেবক'-এর কাজে ইস্তফা দেন। 'সেবক'-এ তিনি কাজ করেছিলেন মাত্র কয়েক সপ্তাহ। ইস্তফা দেওয়ার পর আর কোনদিনই নজরুল 'সেবক' অফিসে যাননি। নজরুলের পদত্যাগের পর 'সেবক' এর প্রচার সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং কয়েক মাস পরেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

এ সময়ে নজরুল ইসলাম থাকতেন ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে। এখানে থেকেই অত:পর তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন। শেষে এ ব্যাপারে দু'একজনের সমর্থন ও সাহায্য লাভ করেন।

'ধুমকেতু'

নজরুল ইসলাম তাঁর নিজস্ব বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও মতবাদ প্রকাশের উদ্দাম ইচ্ছায় নিজেই পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অন্যের সামান্য আর্থিক সাহায্য নিয়ে তিনি এ পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। তিনি পত্রিকাটির নাম দেন 'ধুমকেতু'। তাঁর বাসস্থান ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে পত্রিকার প্রকাশনালয় স্থাপিত হয়। ১৯২২ সালের ১২ই আগষ্ট 'ধুমকেতু' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। কিছুদিন পর 'ধুমকেতু'র অফিস ৭নং প্রতাপ চাটার্জি লেনে স্থানান্তরিত হয়। 'ধুমকেতু'র জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি আশীর্বাণী দেন। আশীর্বাণীটি পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ছাপা হতো ঃ

"আয় চলে যায়, রে 'ধুমকেতু',
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দু'দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে'
আছে যারা অর্ধচেতন!"

–শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও একটি বাণী পাঠান ঃ

"কল্যাণীয়বরেষু–

তোমাদের কাগজের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া তোমাকে একটিমাত্র আশীর্বাদ করি, যেন শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্যকথা বলিতে পার। তারপর ভগবান তোমার কাগজের বোঝা আপনি বহন করিবেন।"

তোমাদের
শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'ধুমকেতু'র প্রথম সংখ্যায় বের হয় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'ধুমকেতু' ঃ

"আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুন: মহাবিপ্লব হেতু
এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।"

নজরুলের এ কবিতা বাংলা কাব্যের প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে এলো এক আশ্চর্য তেজস্বিতা! বাণীর মশালে লিলিহান শিখায় জ্বলন্ত আগুন দেখে অবাক হলো সবাই। 'বিদ্রোহীতে ছিল আবহমান মানবসত্তার দুর্দম-দুর্বার জয়যাত্রার বজ্রনির্ঘোষ ঘোষণা– আর 'ধুমকেতুতে প্রজ্জলিত হলো প্রত্যক্ষ মহাবিপ্লবের লেলিহান অগ্নিশিখা। বাংলা কাব্য সাহিত্যে এ শৌর্যের প্রকাশ সম্পূর্ণ নতুন। নজরুলের সৃষ্ট বাংলাভাষা কতো যে তেজোদীপ্ত তার পরিচয় পাওয়া গেল 'ধুমকেতু'তে।

সেখানে 'শিল্পের জন্যেই শিল্পকর্ম' এই ছিলো বাংলা কাব্যের লক্ষ্য। সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্– এই ছিলো কাব্যের একমাত্র আদর্শ। আর এই লক্ষ্য ও আদর্শের অনুসরণে লিখিত কবিতাও ছিলো তেজহীন, মন্থরগতি। দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য, মানুষের সত্তার অবমাননা– ঔপনিবেশিক শক্তির নিগ্রহ যন্ত্রণা– এসব নিয়ে সেকালের কবিরা অনেকেই কান্নাকাটি করেছেন, বেদনার কাতরতা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু নজরুলের মতো বাণীর জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে কেউ নিগৃহীত জনতার নির্বাক মিছিলে বিপ্লবী শক্তির এরূপ উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারেন নি। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের একা একক অবদান, যা তাঁর আগেও কোনোদিন ছিলো না– এবং পরেও আর দেখা যায়নি।

শুধু কি তাই?– 'ধুমকেতু' বের করে নজরুল বাংলা কাব্যকে এক তেজস্বী বিপ্লবী রাজনীতির সংগে সংযুক্ত করে দিলেন। বাংলা কবিতা নজরুলের আগে বিপ্লবের সে মুখ আর কখনো দেখেনি। যা সকলের অজ্ঞাত ছিলো– যা কোনদিন কোন কাব্যসেবীর চেতনাকে উদ্ভাসিত করতে পারেনি, 'ধুমকেতু'তে নজরুল এলেন তাতেই অবগাহেন করে– তাঁর বীণা হলো অগ্নিবীণা, তাঁর দৃষ্টিভংগী হলো অগ্নিশিখা, আর তাঁর এক একটি শব্দ ও বাক্য হলো লক্ষ্যভেদী অব্যর্থ অগ্নিশর।

'ধুমকেতু' প্রচার করতে লাগল অগ্নিশিখার মতো বিপ্লবের বাণী, হয়ে উঠল বিপ্লবী দলের মুখপত্র।

'ধুমকেতু'র উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নজরুল লিখেছেন–

"মাভৈ" বাণীর ভরসা দিয়ে 'জয় প্রলয়ঙ্কর' বলে 'ধুমকেতু'কে রথ করে আমার আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু হল। আমার কর্ণধার আমি। আমাকে পথ দেখাবে আমার সত্য।....এ দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে অস্থিমজ্জায় যে পচন ধরেছে, তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না। দেশের যারা শত্রু, দেশের যা কিছু মিথ্যা, ভন্ডামী, মেকি তা সব দূর করতে 'ধুমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনী।... মানুষ ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। যার নিজের ধর্মে বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, যে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।"

নজরুল 'ধুমকেতু'তে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন। এই স্বাধীনতা বিদ্রোহ ছাড়া লাভ করা যাবে না, এটাও তিনি বিশ্বাস করতেন।

'ধুমকেতু'তে তিনি লিখেছেনঃ–

"পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম-কানুন, বাঁধন, শৃঙ্খলা নিষেধের বিরুদ্ধে।... সত্যকে জানবার জন্য বিদ্রোহ চাই।... বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ যদি করতে পার, প্রলয় যদি আনতে পার, তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই... কল্যাণ আসবেই।"

অন্যত্র বলেছেন ঃ– 'ধুমকেতু' কল্যাণ আনিয়াছে কিনা জানি না। 'ধুমকেতু' তাহাদেরি বাণী হইয়া আসিয়াছে– যাহাদের গৃহী আশ্রয় দিতে ভয় পায়, গহন বনে ব্যাঘ্র যাহাদের পথ দেখায়, ফণী তাহার মাথার মণি জ্বালাইয়া যাহাদের পথে দিশারী হয়, পিতা-মাতার স্নেহ যাহাদের দেখিয়া ভয়ে তুহিন শীতল হইয়া যায়।"

'ধুমকেতু'র আদর্শ সম্বন্ধে নজরুল বলেনঃ 'ধুমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

"স্বরাজ-টরাজ বুঝি না। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ দেশকে শ্মশান ভূমিকে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। আমাদের প্রার্থনা করার, ভিক্ষা চাওয়ার কুবুদ্ধিটাকে দূর করতে হবে।"

'ধুমকেতু'র অষ্টম সংখ্যায় নজরুল লিখেছেন ঃ–

"ভয় নাই, ভয় নাই ওগো আমার বিষমুখ অগ্নি নাগ-নাগিনী পুঞ্জ!"

"...কোন্ দুঃসাহসী বন্দি করবে তোমাদের! কারার লৌহদণ্ড দারুণ বিষ দাহনে খসে গলে পড়বে। অত্যুগ্র নিঃশ্বাস-বহিতে কারার কন্দরে কন্দরে ধূ ধূ ধূ ধূ করে আগুন জ্বলে উঠবে। তোমার তড়িৎ জিহ্বার মুহূর্ত ইঙ্গিতে জল্লাদের হাতের খড়্গ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, ফাঁসির রজ্জু ভস্ম হয়ে যাবে!"

যে যুগে এমন স্পষ্ট ভাষায় বিপ্লব ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা অসম সাহসের কাজ ছিল। যে সময়ে ভারতীয় নেতাগণ স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসনের দাবী নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছিলেন, সে সময়েই নজরুল পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

নজরুল তাঁর 'ধুমকেতু'তে প্রকাশিত কবিতাসমূহে যেন অগ্নিবৃষ্টি শুরু করেন। 'রক্তাম্বরযারিণী মা' শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখেছেন ঃ

টু'টি টিপে মারো অত্যাচারে মা,
গল-হার হোক নীল ফাঁসি,
নয়নে তোমার 'ধুমকেতু' জ্বালা
উঠুক সরোষে উদ্ভাসি।।"

১৯২২ সালের ২২শে সেপ্টম্বরের সংখ্যা 'ধুমকেতু'তে বের হয় নজরুলের আর একটি বিখ্যাত কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে'।

'আর কতকাল রইবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল!
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা, আসবি কখন সর্বনাশী?
দেব-সেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে,
রণাঙ্গণে নামবে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে?

* * *

রবির শিখা ছড়িয়ে পড়ে দিক হতে আজ দিগন্তরে,
সে কর শুধু পশল না মা বন্ধ কারার অন্ধ ঘরে!
গগন-পথে রবি-রথের সাত সারথি হাঁকায় ঘোড়া,
মর্ত্যে দানব মানব-পিঠে সওয়ার হয়ে মারছে কোঁড়া!
পুরুষগুলোর ঝুঁটি ধরে বুরুশ করায় দানব জুতো,
মুখে ভজে আল্লা হরি, পুঁজে কিন্তু ডান্ডা-গুঁতো।

* * *

'লানত' গলায় গোলাম ওরা সালাম করে জুলুমবাজে,
ধর্ম্ম-ধ্বজা উড়ায় দাড়ি, গলিজ মুখে কোরান ভাঁজে।
তাজ-হারা যার নাঙ্গা শিরে গরমাগরম পড়ছে জুতি,
ধর্ম্ম-কথা বলছে তারাই, পড়ছে তারাই কেতাব-পুঁথি।
টিকটিকির ঐ লেজুড় সম দিদ্বিদিকে উড়ছে টিকি,
দেব্‌তার আগে পূঁজে দানব, তাদের কাছে সত্য শিখি।
আজ দানবের রংমহলে তেত্রিশ কোটি খোজা গোলাম
লাথি খায় আর চ্যাঁচায় শুধু, 'দোহাই হুজুর, মলাম মলাম!"

* * *

মাদীগুলোর আদি দোষ ঐ অহিংসা বোল নাকি-নাকি
খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাঁকি!
হান্ তরবার, আন্ মা সমর, অমর হবার মন্ত্র শেখা,
মাদীগুলোয় কর মা পুরুষ, রক্তে দেনা, রক্ত লেখা।'

'ধুমকেতু'তে নজরুল এর চেয়েও অগ্নিময় অনেক কবিতা-প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু এ কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর তিনি রাজরোষে পতিত হন এবং রাজদ্রোহী বলে বিচারে তাঁর এক বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়।

বিচারকের সম্মুখে নজরুল তাঁর জবানবন্দিতে বলেছিলেন ঃ

'রাজার পক্ষে রাজার নিযুক্ত রাজ বেতন ভোগী রাজ-কর্মচারী। আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি ও অনন্তকাল ধরে সত্য জাগ্রত ভগবান!– আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে। কিন্তু ন্যায়ের বিচারে সে বাণী রাজদ্রোহী নয়, সত্যদ্রোহী নয়।

'আজ ভারত পরাধীন, তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। কিন্তু দাসকে দাস বল্লে, অন্যায়কে অন্যায় বল্লে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ! এটা ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বলানো– এ কি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে?... এই অন্যায় শাষন লিখা বন্দি সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠিছিল বলেই কি আমি আজ রাজদ্রোহী?

আমার কণ্ঠে কাল-ভৈরবের প্রলয়-তুর্য বেজে উঠেছিল, আমার হাতে 'ধুমকেতু' অগ্নি নিশান দুলে উঠেছিল, সে নর্বনাশা নিশান পুচ্ছ নট-নারায়ণ রূপ ধরে ধ্বংস নাচন নেচেছিল। এ ধ্বং-নৃত্য নব সৃষ্টির পূর্ব-সূচনা। তাই আমি নির্মম, নির্ভীক উন্নত শিরে সে নিশান ধরেছিলাম, তার তূর্য বাজিয়েছিলাম। অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহাকদ্রের তীব্র আহ্বান আমি শুনেছিলাম। আমি তখনই বুঝেছিলাম, আমি সত্য রক্ষার, ন্যায় উদ্ধারের বিশ্বপ্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক।'

নজরুল 'ধুমকেতু'র সম্পাদনা করেছিলেন প্রথম বর্ষের ২১শে সংখ্যা (২৮শে কার্তিক, ১৩২৯) পর্যন্ত।

রাজদ্রোহের অপরাধে নজরুলের জেলে থাকাকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন। সেকালে দেশের একদল যুবক স্বাধীনতার জন্য সন্ত্রাসবাদের আদর্শ গ্রহণ করেন। নজরুলের ভাবপ্রবণ চিত্ত এই আদর্শকে অতি সহজ ভাবেই গ্রহণ করে। বিপ্লবের নীতি যে নজরুল আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর তৎকালে লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যায়। বিপ্লবী দলের কর্মস্থলগুলিতেও তিনি নাকি স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থান করেছিলেন।

তৎকালে 'কল্লোল', 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি' এই তিনটি মাসিক পত্রিকার সাথে নজরুলের আন্তরিক যোগাযোগ ছিল। 'কল্লোলে'র সম্পাদক ছিলেন দীনেশ রঞ্জন দাস, 'কালি-কলমে'র সম্পাদক ছিলেন মুরলীধর বসু এবং 'প্রগতি'র সম্পাদক ছিলেন অজিত কুমার দত্ত। নজরুলের অনেক দেশাত্মবোধক কবিতা এই তিনটি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। ১৩৩০ সাল থেকে ১৩৩৩ সাল পর্যন্ত এসব কাগজের সাথে নজরুল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এছাড়া 'বিজলী' ও 'নারায়ণ'-এ নজরুলের অনেক লেখা বের হয় বলাবাহুল্য, নজরুলের বিপ্লবী ভাবাপন্ন কবিতাগুলি প্রকাশ করবার মতো কোনো কাগজ তখন মুসলমান সমাজে ছিল না।

ব্রজবিহারী বর্মন নজরুলের 'সর্বহারা', 'ফণিমনসা', 'দুর্দিনের যাত্রী' প্রভৃতি কতকগুলি বই-এর প্রথম সংস্করণের প্রকাশক ছিলেন। আর্য পাব্লিশিং হাউসও তাঁর কোনো কোনো বই ছেপেছিলেন। এরপর ডি.এম. লাইব্রেরী নজরুলের অধিকাংশ পুস্তকের প্রকাশক হন।

'লাঙল'

১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর নজরুল জেল থেকে মুক্তিলাভ করেন।

১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল কোলকাতার ৬ নম্বর হাজি লেনে কুমিল্লার গিরিবালা সেনগুপ্তার কন্যা প্রমীলা সেনগুপ্তার সাথে নজরুল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। নজরুলের বিবাহে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন সুলেখিকা মিসেস এম. রহমান। নজরুলের বয়স তখন ২৩ বছর আর প্রমীলার বয়স ছিল ১৬ বছর। বিয়ের কাজী ছিলেন নূর লাইব্রেরীর মালিক মঈন উদ্দীন হোসেন বি-এ, উকিল ছিলেন আবদুস সালাম এবং সাক্ষী মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ও খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন। মিসেস এ. রহমানের উৎসাহে ও ভূপতি মজুমদারের সহায়তায় নজরুল কোলকাতা ছেড়ে সস্ত্রীক হুগলীতে যান। প্রমীলার মাতা গিরিবালা দেবীও তাঁদের সংগে ছিলেন। হুগলীতে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা নজরুলকে বাড়ী ভাড়া দিতে অসম্মত হয়। তখন একজন বিপ্লবী দেশসেবক নজরুল পরিবারকে হামিদুন্নবী নামক এক মোক্তারের বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। এই বাড়ীতে নজরুলের প্রথম পুত্র আজাদ কামালের জন্ম হয়। কিন্তু কয়েক মাস পরেই শিশুটির অকাল মৃত্যু ঘটে।

হুগলীতে থাকাকালে নজরুল সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতিতে যোগদান করতেন। তিনি প্রজা পার্টির হেমন্ত কুমার সরকার ও কম্যুনিষ্ট পার্টির কুতুব উদ্দীন আহমদ প্রভৃতির পরিচালনাধীন শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ পার্টির অনুগত হয়ে পড়েন। এর প্রধান পরিচালক করা হয় কাজী নজরুল ইসলামকে। সম্পাদক হিসেবে মনিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম 'লাঙল'-এ ছাপা হতো। লাঙলের অফিস ছিল কোলকাতার ৩৭নং হ্যারিসন রোডে। 'লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যা বের হয় ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। নজরুল থাকতেন হুগলীতে আর

'লাঙল'-এর অফিস ছিল কোলকাতায়। ফলে হুগলী থেকে কোলকাতায় এসে নজরুলকে 'লাঙল'-এর কাজ করতে হতো।

'লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের আর একটি সত্তার অভিব্যক্তি ঘটে। মানুষকে তিনি যে সবার উপরে স্থান দিতেন এবং তাঁর চোখে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ যে ছিলো না তার সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে উঠে এই সময়ে। 'লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের সুবিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সাম্যবাদীর কিছু অংশ ঃ

গাহি সাম্যের গান–

যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান,
গাহি সাম্যের গান।

* * *

এই বন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি গাহিলেন তিনি কোরানের সাম-গান
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোন মন্দির কাবা নাই।

* * *

গাহি সাম্যের গান–
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্।
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
পূজিছে গ্রন্থ ভন্ডের দল! মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ; গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।

* * *

সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

* * *

বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবে না বন্দি কাহারও উঠিছে ডঙ্কা বাজি'।

১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারী 'লাঙলে'র দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নজরুলের 'কৃষকের গান' কবিতা। তারপর 'শ্রমিকের গান', 'ছাত্রদলের গান', 'সব্যসাচী' প্রভৃতি কবিতা লিখে নজরুল 'লাঙল'কে জনপ্রিয় করে তোলেন।

'লাঙল' পরিচালনাকালে হুগলী থেকে কোলকাতায় এসে অফিস করার দুর্ভোগ পোহানো ছাড়া নজরুলের বিশেষ কোনো আর্থিক লাভ হয়নি। বরং একটা আদর্শগত অনুভুতির তাড়নায় নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে থেকেও তিনি 'লাঙল' পরিচালনা করতেন। অনেক সময় 'লাঙল' অফিসে যাতায়াতের খরচও তাঁর কাছে থাকতো না। 'লাঙল' অফিসে তাঁর আর্থিক দুরবস্থা নিয়ে আলোচনা হতো– কিন্তু'লাঙল' গোষ্ঠীর কেউ তাঁকে অর্থ দিয়ে বিশেষ সাহায্য করতে পারেন নি।

হুগলীতে নজরুল ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েন। এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে থেকেই নজরুল চাষী, মজুর এবং উৎপীড়িত জনগণের জন্যে বহু কবিতা ও গান রচনা করেন। আর এই সময়েই তিনি উপলব্ধি করেন, বিপ্লবী দলের সংগে প্রকৃতপক্ষে দেশের সর্বহারা শ্রেণীর কোনো সম্পর্ক নেই। অত:পর তিনি সাম্যবাদের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু এসব গান ও কবিতা লিখে নজরুলের আর্থিক অবস্থার অবনতি ছাড়া উন্নতি হয়নি। 'লাঙলে'র আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে সেখান থেকে বিশেষ পারিশ্রমিকও তিনি পাননি। ১৯২৬ সালের ১৫ই ইপ্রিল 'লাঙলে'র শেষ সংখ্যা প্রকাশ লাভ করে।

'নওরোজ'

১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে 'মোসলেম ভারত' বন্ধ হয়ে যায়। এর পরিচালক মোহাম্মদ আফজাল-উল হক ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে নব উদ্যমে 'নওরোজ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বের করেন। কবি বেনজীর আহমদ এ পত্রিকার আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করেন। নজরুল ইসলাম সক্রিয়ভাবে এই কাগজে যোগদান করেন এবং তাঁকে একটা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা করা হয়। নজরুল তখন কোলকাতা ও কৃষ্ণনগর দু'জায়গায় যাতায়াত করতে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: পাঁচটি সংখ্যা বের হবার পরই 'নওরোজ' বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর নজরুলের সাথে কোনো সাময়িক পত্রের সম্পর্ক থাকে না। অনেকের ধারণা, 'মোসলেম ভারত' ও 'নওরোজ'-এ নজরুলের অসংখ্য লেখা বের হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'মোসলেম ভারত'-এ নজরুলের কবিতা গান মিলিয়ে ১৬/১৭টির বেশী লেখা বের হয়নি। 'নওরোজে' স্থায়ী ভাবে কাজ করার জন্যে নজরুলের সাথে কথা হয়েছিল। এ কাগজে কয়েকটি কবিতা গান ছাড়াও তিনি তাঁর 'কুহেলিকা' উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু অতি অল্প অংশ প্রকাশিত হওয়ার পরই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে 'কুহেলিকা' উপন্যাসের সম্পূর্ণ অংশ ধারাবাহিক ভাবে সাপ্তাহিক 'সওগাতে' প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংখ্যা 'নওরোজ' (আষাঢ় ১৩৩৪) নজরুল ইসলাম 'নওরোজ' নামে একটি কবিতা এবং 'ঝিলিমিল' নামে একটি একাঙ্কিক লেখেন। 'নওরোজ' শীর্ষক কবিতার আরম্ভ ছিল ঃ

"রূপের সওদা কে করিবি তোরা আয় রে আয়
নওরোজের এই মেলায়।"

'ঝিলিমিলি' একাঙ্কিকার গানগুলি উল্লেখযোগ্য। এতে চারটি গান ছিল ঃ
'ঝরে ঝরঝর কোন গভীর গোপন ধারা', 'হৃদয় যত নিষেধ হানে', 'শুকাল মিলন-মালা', 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয়।"

শ্রাবণ সংখ্যা 'নওরোজে' নজরুলের গান 'আসিলে এ ভাঙা ঘরে' ও 'সেতুবন্ধ' একাঙ্কিকাটি ছাপা হয়। এতেও পাঁচটি গান ছিল ঃ

'গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু', 'হাজার তারার হার হয়ে গো', অধীর অম্বর গরজনে', চরণ ফেলি গো মরণ-ছন্দে'. নমো হে নমো যন্ত্রপাতি'।

ভাদ্র সংখ্যা 'নওরোজে' উপন্যাস ছাড়া দুটি কবিতা ও একটি গান প্রকাশিত হয়। কবিতা ঃ 'ভীরু' এবং 'চিরঞ্জীব জগলুল'। গান ঃ 'কেন দিলে এ কাঁটা।'

'ভীরু কবিতার কয়েকটি লাইন ঃ
"কিসের তোমার শঙ্কা এ, আমি জানি।
পরানের ক্ষুধা দেহের দু'তীরে করিতেছে কানাকানি
বিকচ বুকের বকুল গন্ধ–
পাপড়ি রাখিতে পারে না বন্ধ,
যত আপনারে লুকাইতে চাও তত হয় জানাজানি।
অপাঙ্গে আজ ভীড় করেছে গো লুকানো যতেক বাণী।
কিসের তোমার শঙ্কা এ, আমি জানি।"
'নওরোজে' নজরুলের বিপ্লবাত্মক কোনো রচনা প্রকাশিত হয়নি।